পুঁইমাচা : নানা দৃষ্টিকোণ থেকে

সৌগত চট্টোপাধ্যায়

প্রকৃতিপ্রেমিক কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রায় দ্বিশতাধিক গল্পের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প 'পুঁইমাচা' প্রথম প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী' পত্রিকার ১৩৩১ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায়। গল্পটির বিষয়বস্তুর মধ্যে তেমন কোন নূতনত্ব নেই। ক্ষেন্তির মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করে গল্পটি রচিত। সেই এ গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র। তার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল মণিগাঁয়ের শ্রীমন্ত মজুমদারের পুত্রের সঙ্গে। বিয়ের সবকিছু যখন প্রায় পাকা, আশীর্বাদও হয়ে গেছে, তখন ক্ষেন্তির পিতা সহায়হরি হঠাৎ জানতে পারলেন ছেলেটির চরিত্র ভাল নয়। স্বাভাবিক ভাবেই তাই তিনি সম্বন্ধ নাকচ করে দেন। কিন্তু নাকচ করে দিলেও সহায়হরি ভুলে গিয়েছিলেন, যেখানে তিনি বাস করেন তার নাম 'সমাজ', সমাজে একবার কোন মেয়ের বিয়ে পাকা হয়ে গেলে সেই মেয়েকে নাকি বলে 'উচ্ছগ্‌গু' করা মেয়ে, উচ্ছগ্‌গু করা মেয়ের বিয়ে কোন কারণে স্থগিত হলে তার এবং তার পরিবারের অখ্যাতি রটে। এ নিয়েই স্ত্রী অন্নপূর্ণার সঙ্গে সহায়হরির বিরোধ। সেদিন সহায়হরি তারকখুড়োর গাছ থেকে একটু খেঁজুর রস আনবে বলে একটি বাটি কি ঘটী কিছু একটা চাইলেন। অন্নপূর্ণা প্রথমে কিছু বলেন নি, কিন্তু তারপর বেশ ঝাঁঝালো হয়েই বলে উঠেছেন, "একঘরে করবে গো, তোমাকে একঘরে করবে, কাল চৌধুরীদের চন্ডীমণ্ডপে এসব কথা হয়েছে। আমাদের হাতে ছোঁয়া জল আর কেউ খাবে না।.....যাও, ভালোই হয়েছে তোমার। এখন গিয়ে দুলে-বাড়ি, বাগ্দী-বাড়ি উঠে ব'সে দিন কাটাও।" অনতিবিলম্বে মেয়ে ক্ষেন্তি আবার কোথা থেকে চাট্টি পুঁইডাটা এনে হাজির করলে অন্নপূর্ণার আর ক্রোধের অন্ত থাকে না, বলে ওঠেন "বিয়ে হলে যে চার ছেলের মা হতে? খাওয়ার নামে আর জ্ঞান থাকে না, না?.....কোথায় শাক, কোথায় বেগুন; আর একজন বেড়াচ্ছেন—কোথায় রস, কোথায় ছাই, কোথায় পাঁশ.....ফেল্ বলছি ওসব.....ফেল্।"

এই নিয়েই অন্নপূর্ণার সংসার। সংসারে দারিদ্র্য রয়েছে, রয়েছে 'উচ্ছগ্‌গু' করা মেয়ে আর উদাসীন স্বামীকে নিয়ে অন্নপূর্ণার চিন্তা। নিন্দা অপমান আর তিরস্কার। তবু তারই মাঝে রয়েছে আবার একটু আনন্দও। সেদিন পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে অন্নপূর্ণা পিঠে তৈরি করতে বসেছিলেন। ক্ষেন্তি মাকে জোগাড় দিচ্ছিল। ছিল ক্ষেন্তির দুই বোন পুঁটি ও রাধীও। খাওয়ার সময়ে ক্ষেন্তিই পিঠে বেশি খেয়েছিল। যতই অন্নপূর্ণা তাঁর এই ভোজনরসিক মেয়েটির প্রতি বিরক্ত হন তবু তিনি মা। মায়ের প্রাণ কোমল মমতাশীল। তাই জিজ্ঞেস করলেন, "ক্ষেন্তি, আর নিবি?.....ক্ষেন্তি খাইতে খাইতে শান্তভাবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। অন্নপূর্ণা তাহাকে আরও খানকয়েক দিলেন।"

তারপর হঠাৎ একদিন বৈশাখ মাসের প্রথমে সহায়হরির দুসম্পর্কিয় এক আত্মীয়ের ঘটকালিতে ক্ষেন্তির বিবাহ হয়ে গেল। বিবাহে বরপক্ষ যা পন চেয়েছিলেন তা সহায়হরি পুরোটা দিতে পারেননি, আড়াইশ টাকার মতো বাকি ছিল, আর তারই পরিণামে ক্ষেন্তির

ওপর চলে মানসিক নির্যাতন। তার পিতৃগৃহে আসাও বন্ধ হয়। শেষপর্যন্ত বসন্ত রোগ হয় ক্ষেন্তির, তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাকে সহায়হরিরই এক আত্মীয়ার বাড়ি তুলে দিয়ে যায়। গা থেকে গহনাগুলি পর্যন্ত খুলে নেয়। একদিন সেখানেই ক্ষেন্তির মৃত্যু হয়।

তারপর কয়েকমাস কেটে গেছে। বছর ঘুরে আবার এসেছে পৌষপার্বণের দিন। অন্নপূর্ণা পিঠে তৈরি করতে বসেছেন। রাত্রে অনেকক্ষণ পর পিঠে গড়া যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন এমনসময়ে ক্ষেন্তির এক বোন পুঁটি হঠাৎ বলে উঠল "দিদি বড় ভালোবাসত....."। হঠাৎ সকলেরই চোখে পড়ল উঠানের এক কোণে রোপিত এক পুঁইগাছের ওপর। গাছটি ক্ষেন্তিই নিজের হাতে পুঁতেছিল। তখনও "বর্ষার জল ও কার্তিক মাসের শিশির লইয়া কচি কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে সব ধরে নাই, মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে.....সুস্পষ্ট নধর, প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর।" ক্ষেন্তিরও তো এমনভাবে লাবণ্যে পূর্ণ হয়ে বেড়ে ওঠারই কথা ছিল। কিন্তু সে সুযোগ সে পেল না—এমন এক ট্রাজিক রসের মধ্য দিয়েই গল্পটির সমাপ্তি টানা হয়েছে।

গল্পটির নামকরণ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। নামকরণ হল সেই চাবিকাঠি যা পাঠককে বক্তব্যবিষয়ের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে সাহায্য করে। নামকরণ করার নির্দিষ্ট কোন রীতি না থাকলেও সাধারণতঃ প্রধান চরিত্র, বক্তব্যবিষয় অথবা বিষয়কে ব্যঞ্জিত করার উপযোগী নামকরণই লক্ষিত হয়। এসবের প্রেক্ষিতেই আমাদের আলোচ্য 'পুঁইমাচা' গল্পটির নামকরণের যৌক্তিকতা বিচার্য।

গল্পটির নামকরণের মূলে গল্পের একেবারে শেষের পংক্তি অথবা অনুচ্ছেদে প্রকৃতির প্রতীকায়িত ব্যঞ্জনাকে অনেকেই দায়ী করেছেন। ঐ অনুচ্ছেদে পুঁইগাছের সুস্পষ্ট ক্রমবর্ধমান লাবণ্যের সঙ্গে যোগ রেখে ক্ষেন্তির জীবনের কোথায় যেন একটি যোগসূত্র বিদ্যমান রয়েছে তা আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন অনেকেই। প্রয়াত সমালোচক গোপিকানাথ রায়চৌধুরী বলেছেন, ঐ বেড়ে ওঠা সুপুষ্ট পুঁইগাছটি স্বরূপত ক্ষেন্তির জীবনতৃষ্ণারই রূপক, অকালে সে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেও তার আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি তো মৃত্যুহীন, পুঁইগাছটি যেন তার সেই মৃত্যুহীন প্রাণেরই ব্যঞ্জনা বহন করে আনে—"সেই লোভী মেয়েটির লোভের স্মৃতি পাতায় পাতায় শিরায়-শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের হাতে পোঁতা পুঁইগাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে.....মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে.....সুপুষ্ট নধর, প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর।"

এখনে প্রতিটি শব্দ লেখক অত্যন্ত সচেতন ভাবে ব্যবহার করেছেন। পুঁইগাছের মাচা জুড়ে বেড়ে ওঠা, ক্রমবর্ধমান হয়ে মাচা থেকে বাইরে ঝুলে পড়া এবং সর্বোপরি সুপুষ্ট নধর হয়ে জীবনের লাবণ্যে পূর্ণ হওয়া বুঝিয়া ক্ষেন্তি বেঁচে থাকলে তার জীবন ও যৌবন বিকাশের পূর্ণ সম্ভাবনাকেই ইঙ্গিত করছে। কেউ কেউ আবার নামকরণটির মূলে বিভূতিভূষণের প্রকৃতিপ্রেমের প্রকাশও লক্ষ্য করে থাকেন, যেমন করেছেন বীরেন্দ্র দত্ত তাঁর 'বাংলা ছোটগল্প: প্রসঙ্গ ও প্রকরণ' নামক গ্রন্থে—"বিভূতিভূষণের কাছে প্রকৃতি তাঁর আত্মার আত্মীয়। সেই প্রকৃতিকে তিনি এ গল্পে পুঁইগাছের প্রতীকে ঘনপিণদ্ধ করেছেন। লেখক প্রকৃতির মধ্যে গভীর রহস্যের সন্ধান করেছেন নানাভাবে।.....নায়িকার জীবন ও পুঁই-এর জীবনের বৈপরীত্যের

মূলেই প্রকৃতি-ভাবনার সূত্রে লেখক-ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনা।.....ক্ষেন্তির সামগ্রিক জীবন ও মৃত্যু প্রকৃতিরই খেলা। এই খেলা নির্মম ও নিরাসক্ত। তা না হলে ক্ষেন্তির চলে যাওয়ার পরেও কোন রহস্যে তারই শিশুকালে লালন করা বড় আদরের পুঁইগাছটি সুপুষ্ট, নধর প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর হয়ে ওঠার প্রেরণা পায়?'

কিন্তু তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়, গল্পটির নাম 'পুঁইগাছ' কিংবা 'পুঁইচারা' হল না কেন? প্রশ্নটি উক্ত লেখকও তুলেছেন। আমাদের উত্তর এই—'পুঁইগাছ' বললে তার ক্রমবর্ধমানতা কিংবা তার লাবণ্যকান্তির ওপর ইঙ্গিত প্রদত্ত হয় না, 'পুঁইচারা' বললে তো নয়ই, কিন্তু 'পুঁইমাচা' বললেই তৎক্ষণাৎ যেন মাচা থেকে দুলে পড়া একটি গাছের লাবণ্য তথা যৌবনের ছবি পাঠকের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, যার বিপরীতে ক্ষেন্তির জীবনের করুণ পরিণতি তাৎপর্যময়। আবার গল্পটির নামকরণ যদি ক্ষেন্তির নামানুসারে হত তাহলে তা খুবই সাদামাটা ব্যাপার হত। সেদিক থেকে বরং বর্তমান নামকরণটি অনেকবেশি ব্যঞ্জনা মণ্ডিত হয়ে উঠেছে স্বীকার করতে হয়।

গল্পে লোকজীবনের প্রেক্ষিতকেও গ্রহণ করা হয়েছে, ব্যবহৃত হয়েছে লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান। প্রায় একইরকম ভৌগোলিক-সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ থেকে উদ্ভূত যে বিশেষ এক জনগোষ্ঠী তাদের ঐতিহ্যানুযায়ী অনুশীলনে স্বাভাবিক দক্ষতা অর্জন করে সেই সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টিই হল লোকসংস্কৃতি। সংহত সমাজ বলতে আমরা সেই সমাজকেই এখানে নির্দেশ করতে চাইছি যার অন্তর্গত প্রতিটি মানুষ প্রায় একইরকম জীবনাচরণে অভ্যস্ত, তারা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যা যা করে সেই সবই লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন প্রকরণের মধ্যে কয়েকটির নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে—যেমন ছড়া ধাঁধা প্রবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার লোকসাহিত্য, লোকউৎসব, লোকখাদ্য, লোকবিশ্বাস, লোকচিকিৎসা, লোকতৈজস, লোকপ্রযুক্তি, লোকভাষা, লোকযান, লোকশিল্প, লোকপানীয় প্রভৃতি। পরিশীলিত সাহিত্যের স্রষ্টরা তাঁদের সৃষ্টিকে প্রাণবন্ত করে গড়ে তুলতে এসব লোকজ উপাদানের সাহায্য প্রায়ই নিয়ে থাকেন। আমাদের কালজয়ী সাহিত্যগুলির কালোত্তীর্ণ হওয়ার মূলে অনেকেই দায়ী করেছেন সেসব রচনায় লোকজ উপাদানের বহুল ব্যবহারকে। রবীন্দ্রনাথকেও মন্তব্য করতে দেখা গেছে—আমাদের নিম্নসাহিত্য ও উচ্চসাহিত্যের মধ্যে বরাবর ভিতরকার একটি যোগ রয়েছে, যা আপাতভাবে স্পষ্ট না হলেও সম্বন্ধটা সত্য।

আমাদের আলোচ্য বিভূতিভূষণের 'পুঁইমাচা' গল্পেও আমরা তার প্রতিফলন লক্ষ্য করি। এসেছে এখানে চন্ডীমণ্ডপের কথা, লোকখাদ্য-লোকপানীয়-লোকবিশ্বাস-লোকউৎসব প্রভৃতির প্রসঙ্গ, ঘটেছে প্রবাদ প্রভৃতির ব্যবহার। গ্রামীণ মেয়েলি ভাষার ছাঁদটিও ধরা পড়েছে ক্ষেন্তির মায়ের কথোপকথনে। গল্পটি শুরুই হয়েছে খেজুর রসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে, যা আদতে লোকপাণীয়েরই উদাহরণ। ক্ষেন্তির বাবা সহায়হরি চাটুজ্জে গ্রামের প্রতিবেশী তারক খুড়োর গাছ থেকে খেজুর রস আনতে যাওয়ার আগে স্ত্রীকে বলেছেন, "একটা বড় বাটি কি ঘটী যা হয় কিছু দাও তো, তারক খুড়ো গাছ কেটেছে, একটু ভালো রস আনি।" সহায়হরির কথায় স্ত্রী কোনরকম সাড়া দিচ্ছেন না দেখে ফের একটু অগ্রবর্তী হয়ে বললেন, "তুমি তেল

মেখে বুঝি ছোঁবে না?" এই তেল মেখে কিছু না ছোঁয়া একধরনের ট্যাবু বা নিষেধাজ্ঞা, যা গ্রামীণ লোকসমাজ থেকে ধীরে ধীরে এসে প্রবেশ করেছে আমাদের পরিশীলিত সমাজে। গল্পটির আরো এক জায়গায় একধরনের ট্যাবুর পরিচয় বিদ্যমান। সংস্কার হল, ঋতুমতী অবস্থায় মহিলাদের কোন শুভকাজে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ পূজার্চনা বা ঐধরনের কোন ধর্মীয় কাজে। মুখুজ্জে বাড়ির ছোট খুকি দুর্গাকেও তাই ক্ষেন্তির মা অন্নপূর্ণাকে উদ্দেশ করে বলতে শোনা গেছে, "—খুড়ীমা, মা বলে দিলে খুড়ীমাকে গিয়ে বল্, মা ছোঁবে না। তুমি আমাদের নবান্নটা মেখে আর ইতুর ঘটগুলো বার করে দিয়ে আসবে?"

নবান্নের কথা যখন এসেই গেল তখন বলি নবান্ন আমাদের গ্রামবাংলারই এক প্রধান লোকউৎসব। নতুন ধান্যে নবান্ন পালিত হয় গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে। আমন ধান গৃহে আসার পর অগ্রহায়ণ মাসের কোন এক বিশেষ শুভ দিন দেখে পালিত হয় এ উৎসব। নানা ধরনের খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। প্রকারান্তরে এ আসলে কৃষিলক্ষ্মীরই উৎসব। আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান, তাই নবান্ন উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে গ্রামবাংলার মানুষ কৃষির প্রতি জ্ঞাপন করেন তাদের কৃতজ্ঞতা। আলোচ্য 'পুঁইমাচা' গল্পেও এসেছে তার কথা। শুধু নবান্ন নয়, এসেছে পৌষপার্বণের কথাও। পৌষপার্বণ মানেই পিঠে পরব। 'পুঁইমাচা' গল্পের বেশ খানিকটা অংশ জুড়েই রয়েছে তার বর্ণনা, এসেছে পায়েস-ঝোলপুলি-মুগতক্তি এবং পাটিসাপটার কথা। এসব লোকখাদ্যেরই উদাহরণ বলাই বাহুল্য। শুধু তাই নয়, পিঠে তৈরির প্রসঙ্গে যে লোকযন্ত্রটির কথা গল্পে উল্লিখিত হয়েছে তা হল কুড়ুল। কুড়ুল ছাড়াও রয়েছে চুলা, খুন্তি, প্রভৃতির উল্লেখ। লোকতৈজসপত্রাদির মধ্যে এসেছে পিঁড়ি, ঘটী, হুঁকো প্রভৃতির প্রসঙ্গ। হুঁকো খাওয়া একধরনের লোকনেশা। সহায়হরির এ নেশা ছিল। লোকযানের মধ্যে কেবল উল্লিখিত হয়েছে পাল্‌কি। ক্ষেন্তির শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার বর্ণনায় পাই তারই উল্লেখ—"বাড়ীর বাহির হইয়াই আমলকীতলায় বোহারারা সুবিধা করিয়া লইবার জন্য বরের পাল্কী একবার নামাইল। অন্নপূর্ণা চাহিয়া দেখিলেন.....ক্ষেন্তির কম দামের বালুচরের রাঙা চেলীর আঁচলখানা পাল্কীর বাহির হইয়া সেখানে লুটাইতেছে।"

এই শ্বশুরবাড়ি যাওয়াই ক্ষেন্তির কাল হল, বছর ঘুরতে না ঘরতেই ঘটল তার মৃত্যু। এদিকে আবার এসে গেল পিঠে পার্বণের উৎসব। অন্নপূর্ণা যথারীতি পিঠে তৈরি করতে বসেছেন। হঠাৎ ক্ষেন্তির এক বোন পুঁটি হঠাৎ বলে উঠল, "মা, দাও, প্রথম পিঠেখানা কাঁনাচে ষাড়া-ষষ্ঠীকে ফেলে দিয়ে আসি।" ষাড়া ষষ্ঠী আসলে এক লোকদেবী। বনে জঙ্গলে নাকি তাঁর অধিষ্ঠান। তাঁকে পিঠে উৎসর্গ করে পিঠে খাওয়ার কথা আমরা ও গল্পেই পাই।

গল্পে ব্যবহৃত হয়েছে একাধিক প্রবাদ বা প্রবাদমূলক বাক্যাংশও। যেমন বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাওয়া, একঘরে করা, পিঁপড়ের টোপ, কলের পুতুল, জাতমারা প্রভৃতি। লোকউৎসবের উদাহরণ রূপে কেবল নবান্নের কথাই গল্পে আসেনি, এসেছে অরন্ধনের কথাও, এসেছে হরিপুরের রাসের মেলার প্রসঙ্গ, এসেছে চণ্ডীমণ্ডপের কথাও। চণ্ডীমণ্ডপে বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আগে চারচালা বা আটচালা চণ্ডীমণ্ডপ দেখা যেত, তৈরি হত মাটি দিয়ে। ওপরে থাকত খড়ের ছাউনি। এখন অবশ্য পাকা চণ্ডীমণ্ডপ দেখা যায় গ্রামেগঞ্জে। চণ্ডীমণ্ডপে কেবল বাৎসরিক পূজাই নয়, সেইসঙ্গে কীর্তন, কথকতার

আসর, মোড়ল বা গ্রামপ্রধানদের উপস্থিতিতে গ্রামের কোন একটি ঘটনা নিয়ে আলোচনা অথবা বিচার প্রভৃতিও চণ্ডীমণ্ডপে হয়ে থাকে, যেমন হয়েছিল 'পুঁইমাচা' গল্পে ক্ষেন্তির প্রথম বিবাহের সম্বন্ধ সব পাকা হয়ে গিয়েও তা ভেঙে যাওয়ার প্রেক্ষিতে। চণ্ডীমণ্ডপের কালীময় ঠাকুর বেশ কড়া গলাতেই সহায়হরিকে শুনিয়ে দিয়েছিলেন, ".....পাত্তর আশীর্বাদ হয়ে গেল, তুমি বেঁকে বসলে কি জন্য শুনি? ও তো একরকম উচ্ছগ্‌গু করা মেয়ে। আশীর্বাদ হওয়াও যা বিয়ে হওয়াও তা,.....সমাজের বামুনদের যদি জাত মারবার ইচ্ছে না থাকে, মেয়ের বিয়ের বন্দোবস্ত করে ফেল।"

এই হল সেকালের গ্রাম্যসমাজ। ক্ষেন্তির মা অন্নপূর্ণার কথোপকথনেও উঠে এসেছে মেয়েলি গ্রাম্যভাষার ধাঁচ। যেমন—দেখ রঙ্গ কোর না বলছি, একঘরে করবে গো তোমাকে একঘরে করবে, অত নোলা কিসের প্রভৃতি। এভাবেই নানা অনুষঙ্গে 'পুঁইমাচা' গল্পে বাংলার লোকায়ত জীবনের পরিচয় মেলে, লোকজ উপাদানের সমাবেশে গল্পের ঘটনাপট চরিত্র প্রভৃতিও জীবন্ত হয়ে ওঠে।

অতঃপর সমাজচিত্রের প্রসঙ্গ। সাহিত্যকে বলা হয় সমাজের দর্পণ। কবি সাহিত্যিক বা লেখক যেহেতু সমাজেরই সৃষ্টি সেহেতু সমাজজীবনের প্রতিফলন তাঁদের লেখায় পড়তে বাধ্য। সমাজচেতনার দ্বারা লেখকরা কমবেশি প্রভাবিত হন বা হয়ে থাকেন। আমাদের আলোচ্য গল্পটিও তার ব্যতিক্রম নয়। গল্পের মূল কাহিনীটি পল্লবিত হয়েছে যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে তা হল পণপ্রথা। পণপ্রথা দুষ্ট ক্ষতের মতো আজও আমাদের সমাজদেহে বিদ্যমান। ক্ষেন্তির বিবাহেও তার পিতা সহায়হরিকে পণ দিতে হয়েছিল এবং আড়াইশ টাকার মতো বাকি থাকায় ক্ষেন্তিকে তার পিতৃগৃহে পাঠাতে চাইতেন না তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা, বলতেন "ও টাকা আগে দাও তবে মেয়ে নিয়ে যাও"। শেষে মেয়ের নামে তারা নিন্দা ওঠাল। ক্ষেন্তি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হলেও কোন সংবাদ তারা দেননি। শেষে ক্ষেন্তির গা থেকে গহনা খুলে নিয়ে তাদেরই দুসম্পর্কিয় এক আত্মীয়ার গৃহে এনে ক্ষেন্তিকে তারা তুলে দিয়ে যান এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা' গল্পের মতো এগল্পেও সমাজবাস্তবতার পটে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে পণপ্রথার বিষময় ফল।

গল্পে এসেছে 'একঘরে করার' প্রসঙ্গ। 'একঘরে করা' অর্থে বোঝায় কোন ব্যক্তির সঙ্গে সামাজিক সব সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা, কোনভাবেই তার সঙ্গে যোগাযোগ না রাখা। আগেকার দিনে কোন ব্যক্তি সমাজে গুরুতর অপরাধে অপরাধী বিবেচিত হলে গ্রামের পাঁচজনে মিলে সভা করে তাকে 'একঘরে' করতেন। কোনরকম সামাজিক কার্যে তিনি নিমন্ত্রিত হতেন না, তার হাতের ছোঁয়া জল কেউ খেতেন না। তেমনই নাকি গুরুতর অপরাধ করে বসেছিলেন ক্ষেন্তির পিতা সহায়হরি। তাঁর অপরাধ, কথাবার্তা হয়েও শেষপর্যন্ত নির্দিষ্ট পাত্রে তিনি মেয়ের বিয়ে দেননি। সম্বন্ধটি ঠিক করে দিয়েছিলেন কালীময় ঠাকুর। আসল ঘটনাটি হল এই—পাত্রপক্ষ আশীর্বাদ করে যাওয়ার দিনকতক পর সহায়হরি সংবাদ পান তার চরিত্র ভালো নয়। কোন এক কুম্ভকার বধূর সঙ্গে সে এমনকিছু আচরণ করে যে বধূটির আত্মীয়স্বজন কর্তৃক প্রহৃত হয়ে পাত্রটি কিছুকাল শয্যাগত ছিল। অতএব এমন চরিত্রহীন পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব নাকচ করে দেন সহায়হরি, আর তাতেই যত রাগ চাপে

কালীময় ঠাকুরের। চণ্ডীমণ্ডপে বসে তিনি সহায়হরিকে স্পষ্টই জানিয়েদেন, "ও তো একরকম উচ্ছগ্‌গু করা মেয়ে। আশীর্বাদ হওয়াও যা বিয়ে হওয়াও তা, সাত পাকের যা বাকি, এই তো?.....সমাজে ব'সে এ-সব কাজগুলো তুমি করবে আর আমরা ব'সে ব'সে দেখব এ তুমি মনে ভেব না।" স্ত্রী অন্নপূর্ণা আগেই সহায়হরিকে এর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, "একঘরে করবে গো তোমাকে একঘরে করবে, কাল চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপে এসব কথা হয়েছে।" এই ছিল সমাজ-বিধান। প্রসঙ্গত বলি, 'সাতপাকের বিয়ে' এটি একটি প্রবাদমূলক বাক্যাংশ। হিন্দুধর্মের নিয়মানুযায়ী বিয়ের সময়ে বর ও বধূতে একসঙ্গে সপ্তপদ গমন করতে হয়। এক বলে সপ্তপদী। এর ফলে বিবাহবন্ধন দৃঢ় হয় বলে ধর্মীয় সংস্কার। কালীময় ঠাকুরের কথায় সেই সামাজিক রীতিটির প্রতিই ইঙ্গিত প্রদত্ত হয়েছে। তাঁর মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে তৎকালীন গ্রামপ্রধানদের বাস্তব চেহারাও।

অন্যদিকে সহায়হরি, অন্নপূর্ণা এবং বাকি সব চরিত্রগুলিও গ্রামজীবনের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার। মেয়ের বিয়ের জন্য অন্নপূর্ণার দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে রূপ পেয়েছে তাবৎ গ্রাম্যজননীর দুশ্চিন্তা। তুলনায় বরং সহায়হরির চরিত্রটি একটু বেমানান। মেয়ের মতো তিনিও পাড়া ঘুরে ঘুরে বেড়ান। অন্নপূর্ণার মতো মেয়ের বিয়ে নিয়ে তিনি মোটেই ততটা ভাবিত নন। অন্যদিকে ক্ষেন্তির চরিত্রে রূপ পেয়েছে গ্রামবাংলারই এক অতি সাধারণ সহজস্বভাবের মেয়ে, যার চলতে ফিরতে কোথাও যেন এতটুকু বাধে না। ভোজনপ্রিয়তা ও সারল্য তাকে আমাদের অতি কাছে নিয়ে আসে।

গল্পে এসেছে পৌষপার্বণ, নবান্ন, অরন্ধন, হরিপুরের রাস প্রভৃতি নানা লোকউৎসব লোকাচারের কথা, এসেছে চণ্ডীমণ্ডপ, নানা লোকখাদ্য, লোকপাণীয়, লোকনেশা, লোকযন্ত্র, ট্যাবু প্রভৃতির প্রসঙ্গ। এসবের মধ্য দিয়ে গ্রামবাংলার লোকায়ত সমাজের প্রতিচ্ছবিই যে ফুটে উঠেছে তা বোধকরি বলার অপেক্ষা রাখে না।

এবার গল্পটিতে চিত্রিত চরিত্রগুলির প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে। প্রখ্যাত সমালোচক গোপিকানাথ রায়চৌধুরী তাঁর 'বিভূতিভূষণ: মন ও শিল্প' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, "বিভূতিভূষণের বাস্তবনিষ্ঠ দৃষ্টি বৃহৎ পটভূমিকায় নানা বর্ণাঢ্য ঘটনা ও জটিল চরিত্রের সূক্ষ্ম ক্রিয়া-পতিক্রিয়ার সমাবেশে যথার্থ স্ফূর্তিলাভ করে না। অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ পরিসরে নিতান্ত সহজ সরল ঘটনা ও তুচ্ছ শাদামাটা মানুষের রূপায়ণে তাঁর বাস্তবতাবোধ সাফল্যের শিখর স্পর্শ করে। আর সেই সাফল্যের স্তরে.....তাঁর গল্পগুলি নিছক বাস্তবনিষ্ঠ বলে প্রতিভাত হয় না, তারা মানুষের তুচ্ছ লৌকিক সুখ দুঃখের অলৌকিক রসনিবিড় ছবি হয়ে যায়।.....গ্রামবাংলার এইসব তুচ্ছ অবহেলিত মানুষের কাহিনি বলতে গিয়ে বিভূতিভূষণের দৃষ্টিতে বারবার ভেসে উঠেছে এদের জীবনের ব্যর্থতা-বেদনা ও বঞ্চনার ছবি। সে ছবি বহুবর্ণ না হতে পারে কিন্তু লেখকের বর্ণবিরল তুলির অনায়াস টানে.....তা নিঃসন্দেহে জীবন্ত ও মর্মস্পর্শী।" উদাহরণ স্বরূপ তিনি 'মৌরীফুল' গল্পের সুশীলা, 'ডাকগাড়ি' গল্পের রাধা, 'বিপদ' গল্পের হাজু প্রমুখের নাম করেছেন, নাম করেছেন 'পুঁইমাচা' গল্পের ক্ষেন্তিরও।

ক্ষেন্তি 'পুঁইমাচা' গল্পের মুখ্য চরিত্র। গ্রাম্যপ্রকৃতির সহজ সরল উন্মুক্ত পরিবেশে সে বেড়ে উঠেছে। প্রকৃতির কোলেই তার স্বাভাবিক বিকাশ। প্রকৃতি থেকে যেন কোনভাবেই

তাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। বনে-বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে সে বেড়ায়। বয়স চোদ্দ পনের। তার আরো দুটি ছোট বোন আছে—পুঁটি ও রাধী। গল্পে আমরা ক্ষেন্তিকে প্রথম পাই এক বোঝা পুঁইশাক হাতে। পুঁইশাকের তরকারী খেতে সে খুব ভালবাসে। তাদের সংসার নিম্ন মধ্যবিত্ত। ক্ষেন্তির পোশাক পরিচ্ছদে তাই দারিদ্র্যের ছাপ। যে সেফটিপিনটি দিয়ে তার হাতের কাঁচের চুড়িগুলি একত্রে বাঁধা তার বয়স খুঁজতে গেলে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে গিয়ে পড়তে হয়। তবে তার চেহারাটি গোলগাল, মাথার চুলগুলি কৃষ্ণবর্ণ ও অগোছালো। দৈর্ঘ্যে ক্ষেন্তি বেশ লম্বা। কিন্তু এহো বাহ্য। তার চরিত্রের আসল বৈশিষ্ট্য লুকিয়ে রয়েছে তার ভোজনপ্রিয়তা ও স্বভাবসুলভ সরলতায়। সে কেবল খায়ই না, সময় সময় মায়ের হাতে হাতে জোগাড়ও দেয় অনেক। পৌষপার্বণের দিন পিঠে হবে বলে সে নারকেল কুরতে বসেছিল। তার ভোজনপ্রিয়তায় অন্নপূর্ণা যতই বিরক্ত হন না কেন, অন্নপূর্ণার প্রশংসা লাভেও ক্ষেন্তি বঞ্চিত নয়। কারণ ক্ষেন্তির সব থেকে বড় গুণ হল সে সাত চড়ে রা কাড়ে না। উঁচু গলায় কখনো কথা বলে না। তাই অন্নপূর্ণাকে বলতে শোনা গেছে, "ক্ষেন্তি আমার যার ঘরে যাবে, তাদের অনেক সুখ দেবে। এমন ভালোমানুষ, কাজে-কর্মে বকো, মারো, গাল দাও, টুঁ শব্দটি মুখে নেই।" শুধু কি তাই, ক্ষেন্তির চরিত্র বিশ্লেষণ করে সমালোচক লিখেছেন, "একাধিক ক্ষেত্রে মায়ের কাছে ধরা পড়ে গিয়েও তার সভয় সত্যভাষণ, যে পুঁইশাক চিংড়ি মাছ দিয়ে খাওয়ার লোভ সেই পুঁইচারা রোপণ ও তাকে খেলার ছলেই বড় করার গোপন-মধুর বাসনা, পৌষসংক্রান্তিতে দারিদ্র্যের সংসারে পিঠে খাওয়ার অদম্য আবেগ এবং স্বাদগ্রহণের কৌতূহল—এসব আমাদের ক্ষেন্তিকে অনেক কাছের করে তোলে।" কিন্তু আমাদের অতি কাছের এই ক্ষেন্তিই একদিন আমাদের ছেড়ে চলে যায় দূরে বহুদূরে। মৃত্যুর হিমশীতল অন্ধকারে। তখন তারই হাতে পোঁতা পুঁইগাছটি বেড়ে উঠছে গাছটির আপন স্বভাবে, জীবন যৌবনে পূর্ণ হয়ে, বুঝিবা তা ক্ষেন্তির 'জীবনতৃষ্ণার'ই রূপক হয়ে।

ক্ষেন্তির পরই চরিত্র হিসাবে উল্লেখ করতে হয় অন্নপূর্ণার কথা। নিম্নবিত্ত পরিবারের বধূ তিনি। দারিদ্র্যের সঙ্গে অপমানের জ্বালা তাঁর নিত্য সহচর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি সব থেকে বেশি বীতশ্রদ্ধ স্বামী সহায়হরির ঔদাসীন্যে। মেয়ে ক্ষেন্তির বিয়ে একবার ঠিক হয়ে ভেঙে গেলেও তাঁর হুঁশ নেই, হুঁশ নেই গ্রামের পাঁচজনের কথায়। সেই রাগই তাঁর গিয়ে পড়ে স্বামী এবং ভোজনরসিক মেয়ে ক্ষেন্তির ওপর। কিন্তু সেসব তাঁর মনের কথা নয়, সংসারের শতজ্বালায় জর্জরিতা অন্নপূর্ণার মানসিক আক্ষেপেরই ফল সেসব। সন্তানের প্রতি মমত্ব ভালবাসা তাঁরও রয়েছে বৈকি! তাই ক্ষেন্তির বয়ে আনা পুঁইডাটাগুলি তিনি ফেলে দিতে নির্দেশ দিলেও পরে আবার সেগুলি উঠান থেকে কুড়িয়ে এনে তাকে তরকারী রেঁধে দিয়েছেন সস্নেহে, পৌষপার্বণে পিঠে রাঁধতে বসেছেন সকলে খেতে ভালবাসে বলে, শতমুখে ক্ষেন্তির ঠান্ডা স্বভাবের প্রশংসাও করেছেন, বলেছেন, "বকো, মারো, গাল দাও, টুঁ শব্দটি মুখে নেই।"

ক্ষেন্তি তার এই স্বভাব বোধকরি তার পিতা সহায়হরির কছে থেকেই পেয়ে থাকবে। সহায়হরিও সংসারকর্মে উদাসীন এবং খাওয়ার প্রতি লোভ তাঁরও রয়েছে। প্রখ্যাত গল্পকার ও সমালোচক বীরেন্দ্র দত্ত লিখেছেন, "তার সাংসারিক দারিদ্র্য তাকে জ্বালা ধরায় না,

ক্ষোভে ভেঙে দেয় না, বরং সেও মেয়ের মতো প্রকৃতির বুকে সাংসারিক সমস্তরকম সীমাবদ্ধতা ও অসঙ্গতি থেকে মুক্তির স্বাদ নেয়। তার মধ্যে কন্যার প্রতি স্নেহ যেমন প্রবল তেমনি কন্যার অপাত্রে বিবাহদানের যুক্তিপূর্ণ বিরোধিতার দিকও স্পষ্ট।"

কালীময় ঠাকুরের চরিত্রে স্পষ্ট সেকালের গ্রামপ্রধানদের চরিত্রটি। সহায়হরি যে 'উচ্ছগ্‌গু' করা মেয়েকে ঘরে রেখে দিয়েছেন এবং অন্যত্র আর কোন বিবাহের সম্বন্ধ করছেন না সেজন্য সহায়হরিকে তিনি বেশ কয়েককথা শুনিয়ে দিয়েছেন, সতর্ক করে দিয়েছেন এই বলে "সমাজে ব'সে এসব কাজগুলো তুমি যে করবে আর আমরা ব'সে ব'সে দেখব এ তুমি ভেব না।" আগেই বলা হয়েছে যে সহায়হরির মেয়ে ক্ষেন্তির প্রথম বিয়ের সম্বন্ধটি কালীময় ঠাকুরই ঠিক করে দিয়েছিলেন। ছেলেটি লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানত না। তবু যে তিনি ক্ষেন্তির সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলেন তাতে তার যুক্তি ছিল— "লেখাপড়া নাই বা জানলে?.....দিব্যি বাড়ি বাগান পুকুর, শুনলাম এবার নাকি কুঁড়ির জমিতে চাট্টী আমন ধানও করেছে, ব্যস্—রাজার হাল! দুই ভায়ের অভাব কি?....."

কালীময় ঠাকুর, সহায়হরি, অন্নপূর্ণা, ক্ষেন্তি প্রমুখ প্রধান চরিত্র ছাড়াও গল্পে আরো কিছু গৌণ চরিত্রেরও উল্লেখ মেলে। যেমন ক্ষেন্তির দুই বোন পুঁটি ও রাধী, ক্ষেন্তির বর ও শাশুড়ি, কেষ্ট মুখুজ্জে, কুম্ভকার বধূ, মুখুজ্জে বাড়ির ছোটখুকী দুর্গা, গয়া পিসি, শ্রীমন্ত মজুমদার, জ্যাঠাইমা প্রভৃতি।

অতঃপর গল্পে প্রতিফলিত লেখকের প্রকৃতিভাবনার প্রসঙ্গ। বিভূতিভূষণের গল্পে প্রকৃতির ভূমিকা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের মন্তব্য, "বিভূতিভূষণের উপন্যাসে প্রকৃতি যে ব্যাপক ও বিশিষ্ট ভূমিকা পেয়েছে তাঁর গল্পসাহিত্যে প্রকৃতির সেই অনন্যতা নেই, সেখানে মুখ্য ভূমিকা মানুষের। কিন্তু তবু নানা ভাবে প্রকৃতি তাঁর গল্পে কিছুটা স্থান করে নিয়েছে ঠিকই।" এমনই একটি গল্প তাঁর আলোচ্য গল্পটি। গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র ক্ষেন্তি একেবারে প্রকৃতির আদলেই গড়া। প্রকৃতির মতোই উন্মুক্ত স্বাধীন এবং সহজ সরল তার স্বভাব। কখনো অনুগত আবার কখনো বা অবাধ্য। মৃত্যুর পর আবার তার প্রকৃতির মাঝেই ফিরে যাওয়া। আর তখন তার সমগ্র অবয়বের অস্তিত্বই যেন হয়ে ওঠে তার হাতে রোপণ করা পুঁইগাছটি, যা লাবণ্যকান্তিতে তখন ভরপুর। অদ্ভুত এ প্রতীকায়িত ব্যঞ্জনায় বুঝিবা লেখক বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে অনুভব করতে চেয়েছেন—ক্ষেন্তি আছে, মরেনি, সে তার আপন স্বভাব ও লাবণ্য নিয়েই বিশ্বচরাচরে বিদ্যমান। লেখক যেন তাকে পুঁইগাছের সঙ্গে যুক্ত করে ব্যাপক অর্থ তাৎপর্য দিয়েছেন। এখানেই বিভূতিভূষণের রোমান্টিক মনের বড় বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে।" এছাড়াও সমগ্র গল্পে গাছ-লতাপাতায় ঘেরা গ্রাম্যপ্রকৃতির জীবন্ত চিত্রও উপহার দিয়েছেন বিভূতিভূষণ। সব মিলিয়ে গল্পটি পাঠ করে কেন জানি না তারাশঙ্করের 'কবি'র মতই বলতে ইচ্ছা করে—

হায় জীবন এত ছোট কেনে।

পরিশেষে আরো কিছু কথা থেকে যায়। গল্পটির শ্রেণী বা গোত্র বিচার করলে একে সমাজসমস্যা মূলক গল্পই বলতে হয় সাধারণ ভাবে। প্রকৃতিচেতনার প্রতিফলনও গল্পে রয়েছে ঠিকই কিন্তু সমাজচেতনাই যেন গল্পটি লেখার সময়ে লেখককে তাড়িত করেছে বেশি। গল্পটির প্লটে কোন জটিলতা নেই, নেই কোন নূতনত্বও, কিন্তু তাও যেন বর্ণনার

নিপুণতায় তা পাঠককে শেষপর্যন্ত আকর্ষণ করে। তবে এটিকে ঠিক ছোটগল্প বলে মনে হয়না কোন দিক থেকেই। প্রয়াত আচার্য সুকুমার সেন ঠিকই ধরেছেন, 'পথের পাঁচালি' উপন্যাসের ছায়া এর মধ্যে সুপ্ত রয়েছে। গল্পটির গঠনকৌশলেও দৃঢ়পিণদ্ধ ভাব বিদ্যমান। ধীরে ধীরে আপন গতিতেই তা ক্রমে এগিয়ে গেছে পরিণতির দিকে। চরিত্রগুলিও অত্যন্ত বাস্তব। গল্পের একেবারে শেষাংশে প্রকৃতিও যেন একটি চরিত্রে রূপান্তরিত, ক্ষেন্তির 'মৃত্যুহীন জীবনতৃষ্ণার' রূপকে রূপকায়িত। ভাষা ব্যবহারেও লেখকের চমৎকারিত্ব বিদ্যমান। অত্যন্ত সহজ সরল ও অনাড়ম্বরময় এ গল্পেব ভাষা চবিত্রগুলির মুখে মানানসই। গল্পটির রস শেষপর্যন্ত করুণ, তবে তা "মানবজীবনের প্রতি ভালবাসা ও সুগভীর মৃত্তিকা-তৃষ্ণার সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত।" সর্বোপরি লেখকের মৃত্যুচেতনাও এখানে ছায়া ফেলেছে ক্ষেন্তির মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করে। তবে অন্যান্য রচনায় যেমন তিনি "মৃত্যুর বিষণ্ণধূসর পটভূমিতে অসহায় অথচ প্রগাঢ় জীবনপ্রীতির হৃদয়স্পর্শী চেতনাকেই পরিস্ফুট করে তুলতে চেয়েছেন," এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী তাঁর উক্ত গ্রন্থে বিভূতিভূষণের 'পুঁইমাচা' সহ মৌরীফুল, ভণ্ডুলমামার বাড়ী প্রভৃতি সার্থক গল্পগুলির রসোত্তীর্ণতার মূলের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে মন্তব্য করেছেন তাঁর "গল্পের মানুষগুলি সকলে মিলে কোন সমষ্ঠিবদ্ধ সমাজ নয়, তারা দারিদ্র্য দুঃখ ও তুচ্ছতার আবরণে ঢাকা এমন কতকগুলি সত্তা, যাদের জীবন— জীবনেব গভীর সঞ্চারী এক পবিচয়ের ইশারা জানায়।.....তবে সেই দৃষ্টিভঙ্গি পবিস্ফুট হয়েছে নরনারীর বাস্তব জীবন-সমস্যার সামাজিক পারিবারিক অর্থনৈতিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতেই। এখানেই বিভূতিভূষণেব গল্পের শিল্পশরীরের শক্তি ও সামর্থ্যের প্রকৃত রহস্য। তাঁর সার্থক গল্পগুলি জীবনের যে গূঢ় পরিচয় বা রসসৌন্দর্যের সংকেতই বহন করুক না কেন, তাদের বাস্তবতা যেন ঘটনায়, চরিত্রে, সংলাপ-পবিবেশে পাঠকের পুরোপুরি প্রত্যযসিদ্ধ," যেন লেখকের আভজ্ঞতার জারকরসে জারিত সে গল্পগুলি। এখানেই বিভূতিভূষণেব অনন্যতা।